The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 14, No. 27-28, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

বাংলা গদ্য ও প্রমথ চৌধুরী

ড. জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ*

Abstract: The emergence of Pramatha Chowdhury in a special historical period of Bengali literature. Pramatha Chowdhury gained a reputation as a storyteller, poet and thoughtful essayist. He wrote the first satirical essay in Bengali literature. In the case of Bengali written language, sadhuriti and chalitariti-those two streams bothered Pramatha Chowdhury. He devoted himself to establishing prose near the language of the mouth. Pramatha Chowdhury revolutionized the Bengali language and literature by publishing 'Sabujpatra' magazine to create different styles of language and establish common language. He was successful in introducing popular prose style in literature. Pramatha Chowdhury was the editor of 'Sabujpatra' magazine. The 'Sabujpatra' magazine was originally published to establish the trend. No advertise was published in 'Sabujpatra' magazine. Sabujpatra was not published for any business purpose. Pramatha Chowdhury's reputation as the publisher and editor of Sabujpatra for the introduction of Bengali language customs is astonishing. In the case of Bengali written language, the introduction of customs is considered as a very important issue for Bengali current language. In this article, an attempt has been made to explore the role of Pramatha Chowdhury in Bangla literature.

চাবি শব্দ: দ্বিরীতি, সাধুরীতি, চলিতরীতি, পাঠ্যপুস্তক, ব্যাকরণ, সর্ববঙ্গ, সবুজপত্র

১. ভূমিকা

প্রমথ (নাথ) চৌধুরী ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ৭ আগস্ট পাবনা জেলার হরিপুরে জমিদার চৌধুরী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দুর্গাদাস চৌধুরী। প্রমথ চৌধুরী পাবনায় জন্মগ্রহণ করলেও বড় হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরে। তিনি কলকাতার ডেভিড হেয়ার স্কুল থেকে এন্ট্রাস এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দর্শন বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে বিএ পাশ করেন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম শ্রেণিতে ইংরজি বিষয়ে এমএ পাশ করেন। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আইন পড়তে ইংল্যান্ডে যান। ব্যারিস্টারি পাশ করার পর দেশে ফিরে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগ দেন এবং পরবর্তীকালে আইন

---

* অধ্যাপক (বাংলা), বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে ইন্দিরা দেবীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ২ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এক বিশেষ ঐতিহাসিক সময়ে প্রমথ চৌধুরীর বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব। প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাবের ফলে বাংলা গদ্যে জীবন ও সাহিত্যের পরম সন্নিপাত ঘটেছিল। উনিশ শতকের পর বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের ক্ষেত্রে এটি ছিল উল্লেখ্যযোগ্য আলোড়ন (কামাল, ২০১৬:৬০)। প্রমথ চৌধুরী গল্প ও কবিতা লিখলেও মননশীল প্রাবন্ধিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ রচনা করেন। বুদ্ধিদীপ্ত তির্যকভঙ্গি তাঁর গদ্য-পদ্য রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। শাণিত যুক্তি ও আলঙ্কারিক ভাষা প্রয়োগেও তিনি দক্ষ ছিলেন। তিনি ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন।

লিখিত ভাষার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সাহিত্য রচনায় ভাষার নানাবিধ প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসেই দেখা যায় পদ্যের সূত্রপাত আগে, গদ্যের আবির্ভাব পরে। এর অর্থ এই নয় যে, কোনো দেশ বা জাতির মৌখিক ভাষা পদ্য হতে ক্রমশ গদ্যে রূপান্তরিত হয়। মানুষ বরাবরই গদ্যেই কতাবার্তা বলে থাকে, কিন্তু ভাষা ও সাহিত্য লিখতে গেলেই স্বভাবত প্রথমে ছন্দ ও মিলের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে (দাস, ১৩৬৬: ভূমিকা)। তাছাড়া, মৌখিক ভাষার সাথে লিখিত ভাষার হুবহু মিল কোনো ভাষার ক্ষেত্রেই দৃষ্ট হয় না। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বাংলায় দুটি রীতি—সাধুরীতি ও চলিতরীতি ভাষা প্রয়োগকারীদের বিভক্ত করেছে। প্রমথ চৌধুরী সাহিত্য রচনায় চলিত রীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং সফল হন।

২. সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা : পারস্পরিকতা অনুসন্ধান

পৃথিবীর প্রতিটি ভাষারই মুখের ভাষা ও লিখিত ভাষা একরকম নয়। তবে, বাংলা ভাষায় দুটি লিখিতরূপ গড়ে ওঠেছে। একটি সংস্কৃত ঘেঁষা সাধুরীতি এবং অপরটি মুখের ভাষার কাছাকাছি চলিতরীতি। বিশুদ্ধ সংস্কৃত (তৎসম) শব্দ, মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার শব্দরূপ, ক্রিয়ারূপ, বিভক্তি, অনুসর্গ ইত্যাদি দিয়ে গড়ে ওঠা কৃত্রিম, বিদগ্ধ, ধীর-গম্ভীর এবং সাহিত্যে সীমাবদ্ধ লিখিত ভাষাকে সাধু ভাষা বলা হয়। প্রমথ চৌধুরীর মতে, নদিয়া, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে, ভাগীরথীর উভয় কূলে এবং বর্ধমান ও বীরভূম জেলার পূর্ব ও দক্ষিণাংশে যে ডায়ালেক্ট বা আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত ছিল, সে উপভাষার সাথে সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত হয়ে সাধুভাষা গড়ে ওঠে (চৌধুরী, ১৯৯৮:২৬৭)।

উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের মূলে কাজ করে পূর্ণাঙ্গ অর্থবোধ ও পরিষ্কার উচ্চারণ। যে উপভাষার শব্দের উচ্চারণ পরিষ্কাররূপে বোধগম্য হয় ও অর্থ যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়, সে উপভাষা অন্যান্য উপভাষা থেকে শ্রেষ্ঠ।

অন্যদিকে, রাঢ়ী, বঙ্গালী, বরেন্দ্রী, কামরূপী ও ঝাড়খণ্ডী উপভাষার মধ্যে রাঢ়ী উপভাষার কলকাতা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সর্ববঙ্গীয় আদর্শ কথ্য বাংলার (Standard Colloquial Bengali=SCB) লিখিতরূপ হলো, চলিত ভাষা (শ’, ৪০৩:৬৬২)। প্রমথ চৌধুরী চলিতরীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়ে তোলেন। চলিতরীতি সম্পর্কে ‘সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা’ প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন, “যখন লেখবার একটা বিশেষ রীতি সাহিত্যে চলন করা নিয়ে কথা, তখন আমাদের একটা কোনো দিক অবলম্বন করতেই হবে। কেননা এক সঙ্গে দুদিকে চলা অসম্ভব। তাছাড়া যখন দুটি পথের মধ্যে কোনটি ঠিক পথ, এ সমস্যা একবার উপস্থিত হয়েছে, তখন ‘এ’ -পথও জানি ‘ও’-পথও জানি, কিন্তু কি করব মরে আছি, এ কথা বলাও আমাদের মুখে শোভা পায় না; কারণ, বাজে লোকে যাই করুক-না কেন, সাহিত্যসেবী এবং আইফেনসেবী একই শ্রেণির জীব নয়” (চৌধুরী, ১৯৯৮:২৭২)। নিচে বাংলা ভাষার রীতি চিত্র-০১-এ দেখানো হয়েছে এবং সাধু ও চলিত রীতির মূল পার্থক্য ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের ব্যবহার চিত্র-০২ ও চিত্র-০৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে:

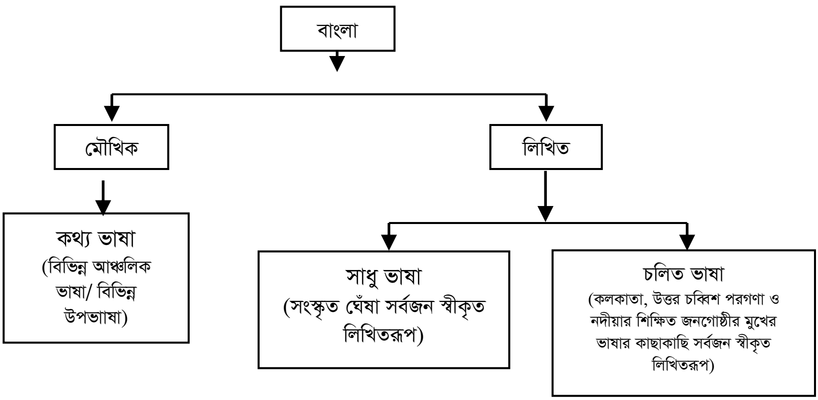

চিত্র-০১

সাধুরূপ ও চলিতরূপের মূল পার্থক্য ক্রিয়াপদ ও সর্বনামবাচক পদের ব্যবহারে; যেমন:

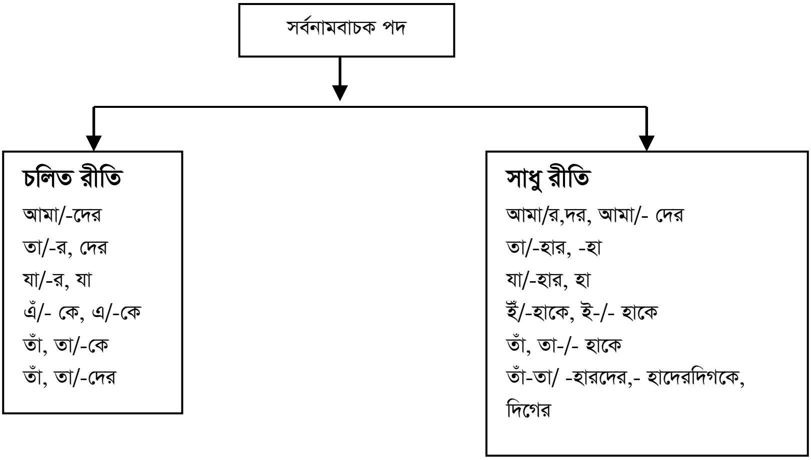

চিত্র-০২

ঊনবিংশ শতকের সাধুভাষার রূপ 'আমারদর' ব্যবহার বর্তমানকালে নিতান্তই নগণ্য। 'দিগের' ও 'দিগকে' যোগে বহুবচনের সাধুরূপ ব্যবহার বর্তমানকালে কদাচিৎ লক্ষণীয়। সাধু ও চলিতের পার্থক্য ক্রিয়াপদের ব্যবহারে বেশি স্পষ্ট। যেমন:

ক্রিয়ার কাল	চলিতরূপ	সাধুরূপ	[কর্তা] সর্বনাম+ক্রিয়া
সাধারণ বর্তমান	খাই খায় খাও	খাই খায় খাও	= আমরা/আমি +খাই = তাহারা/সে +খায় = তোমরা/তুমি +খাও
ঘটমান বর্তমান	খাচ্ছি খাচ্ছ খাচ্ছে	- খাইতেছি - তেছ - তেছে	= আমি/ আমরা = তুমি/ তোমরা = সে/ তাহারা
সাধারণ ভবিষ্যৎ	খাবে খাবে খাবে	- ইব - ইবে - ইবে/ন	= আমরা/আমি = তোমরা/তুমি = তাঁহারা/তিনি, সে, তাঁ, তা

সাধারণ অতীত	খেতাম খেতে খেতে	- - -	ইতাম ইতে ইত	= আমি/আমরা = তুমি/ তোমরা = সে/ তাহারা

চিত্র-০৩ (সেন, ২০০১: ১০৮)

অনেক ভাষা-অঞ্চলেই দুটি ভাষারীতি ব্যবহৃত হয়। একটি ব্যবহৃত হয়-লেখায় ও সাহিত্যে, আর অন্যটি ব্যবহৃত হয় প্রাত্যহিক জীবনে কথোপকথনে ও সামাজিক যোগাযোগে। আরবি, গ্রিক, সুইস-জার্মান ও সীমাবদ্ধরূপে বাংলা ভাষায় দ্বি-রীতি লক্ষ্য করা যায়। ফারগুসন (১৯৫৯) তাঁর 'ডাইগ্লোসিয়া' বা 'দ্বিরীতি' তত্ত্বে একই ভাষার দ্বিরীতির উদ্ভবের কারণ অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর মতে বিভিন্ন কারণে দ্বিরীতির উদ্ভব হতে পারে। এই কারণগুলো বিশেষ ভাষা-অঞ্চল ও ভাষা নির্ভর। তিনি ভাষার দ্বি-রীতিকে, 'উচ্চ' ও 'নিম্ন' রীতি অভিধা দিয়েছেন। আরবি অঞ্চলে উচ্চরীতির নাম 'আল-ফুশাহ্' নিম্নরীতির নাম 'আল-কামিইআহ্; গ্রিক অঞ্চলে উচ্চরীতির নাম 'কুথারিভুসা', নিম্নরীতির নাম 'দিমতিকি'। একইভাবে বাংলার ক্ষেত্রে উচ্চরীতির নাম 'সাধু ভাষা', নিম্নরীতির নাম 'চলিত ভাষা'।

ফারগুসন তাঁর উপাত্তে দেখিয়েছেন উপাসনালয়ের অভিভাষণে, সংসদে ও রাজনীতিক ভাষণে, ক্লাসকক্ষে, বেতার-টেলিভিশনে, সংবাদপ্রচারে, সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় উচ্চরীতি; আর গৃহভৃত্য ও অধস্তনদের প্রতি আদেশে, বন্ধুবান্ধব ও পারিবারিক সদস্যদের সাথে আলাপে, বেতারের 'সোপ অপেরা'য়, রাজনীতিক ব্যঙ্গচিত্রে ও লৌকিক সাহিত্যে নিম্নরীতি ব্যবহৃত হয় (আজাদ, ২০১১:৭৯)।

তবে, বাংলা সাধুরীতি ও চলিতরীতির ক্ষেত্রে দ্বি-ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য নগন্য। লিখিত ও কথ্য ভাষা এখন চলিত রীতিতেই সম্পূর্ণ হয়। আদর্শ দ্বিরীতিতে উচ্চ রীতি ও নিম্ন রীতি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা হলেও বাংলা তেমন নয়। বাংলায় সাধু ও চলিত রীতির মধ্যে বহু সম্পর্ক বিদ্যমান। সেজন্য, ডিমক (১৯৬০) এ রীতি দুটিকে গণ্য করেছেন 'একই ভাষার দুটি বিপরীত মেরু' রূপে (আজাদ:৮১)।

৩. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও বাংলা গদ্য রচনা

লিখিত ভাষার ক্ষেত্রে গদ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। পৃথিবীর প্রতিটি ভাষার সাহিত্যই প্রাথমিক পর্যায়ে ছন্দোবদ্ধ রচনায় হতো। বাংলার ক্ষেত্রেও বিষয়টি সমভাবে প্রযোজ্য। একটি ভাষা যখন পড়ালেখা ও বিভিন্ন যোগাযোগের মাধ্যম হয়, তখনই গদ্যের বিষয়টি সামনে চলে আসে। কোনো ভাষায় সাহিত্য হিসেবে গদ্য রচনা না থাকলেও মানুষ ছন্দোবদ্ধভাবে কথা বলে না, গদ্যের মাধ্যমেই মিথস্ক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকেন।

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এবং পড়ালেখার মাধ্যমের জন্য বাংলা গদ্য রচনার সূত্রপাত হয় মূলত ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে। বাংলা বিভাগ খোলার জন্য বাংলা ভাষায় কোনো পাঠ্যপুস্তক না থাকায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের তৎকালীন বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজ চলে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাংলায় কিছু গদ্য রচনা হলেও সাহিত্য রচনার বিষয়টি দুষ্প্রাপ্য। ষোল থেকে আঠার শতকের বাংলা গদ্যের নিদর্শন বিচ্ছিন্ন এবং তা মূলত দলিল-দস্তাবেজে সীমাবদ্ধ। ধারাবাহিকতা আর ভাবের গদ্যের মাপকাঠিতে তাই উনিশ শতক থেকে বাংলা গদ্যের লক্ষ করা হয়েছে (আনিসুজ্জামান, ১৯৮৪:১৫)।

মুসলমান শাসনকালে অনেকেই নিজেদের কাজকর্মে ফারসির পরিবর্তে বাংলা ব্যবহার করতেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো বাংলা গদ্য। বাংলা গদ্যের ধারণ ক্ষমতা, আশ্চর্য নমনীয়তা এবং রূপবৈচিত্র্যে মানুষের জীবনলব্ধ যাবতীয় অভিজ্ঞতার উল্লেখ্যযোগ্য প্রকাশ মাধ্যম। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দের মহারাজ নরনারায়ণের পত্র হতে শুরু করে ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে মুদ্রিত হ্যালহেডের ব্যাকরণ এবং ১১৮৫ বঙ্গাব্দের ১১ শ্রাবণ তারিখে লিখিত জগতধির রায়ের পত্র পর্যন্ত অপেক্ষকৃত প্রামাণিক যুগ (দাস, ১৩৬৬:১৩)। যাহোক, ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ কর্তৃক আহোম বা আসামবাজ চুকাম্ফা স্বর্গদেবকে (ওরফে খোড়া রাজ) লিখিত একটি চিঠিকেই প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের দৃষ্টান্ত বলে সাহিত্য সমালোচকগণ স্বীকার করেছেন। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ জুন 'আসামবন্তি' পত্রিকায় আসাম, তেজুপুর হতে চিঠিটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। চিঠিটি ছিল নিম্নরূপঃ

> 'স্বস্তি
> সকলদিগদন্তিকর্ণতালস্ফালসমীরণপ্রচলিতহিমকরহারহাসসকাশকৈলাসপাণ্ডবষশোরাশি বিরাজিতত্রিপিষ্টপত্রিদশত-
> রঙ্গিণীসলিলনির্ম্মলপবিত্রকলেবরধীষণপ্রচণ্ডধীরধৈর্যমর্যাদাপারাবারসকলাদিক্কামিনীগীয়মানগুণসন্তানশ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণমহাবাজপ্রচণ্ডপতাপেষু।
>
> লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে বার্দ্ধতাকপাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি। তোমারো এগোট কর্ত্তব্য উচিত হয় না। কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সত্যানন্দ কর্ম্মী রামেশ্বর শর্ম্মা কালকেতু ও ধুমা সর্দ্দার উদ্ভণ্ড চাউনিয়া শ্যামরাই ইমরাক পাঠাইতেছি তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।
>
> অপর উকীল সঙ্গে ঘুড়ি ২ ধনু ১ চেঙ্গর মৎস ১ জোর বালিচ ১ জকাই ১ সারি ৫ খান এই সকল দিয়া গৈছে। আর সমাচার বুজি কহি পাঠাইবেক। তোমার অর্থে সন্দেশ সোমচেং ১ ছিট ৫ ঘাগরি ১০ কৃষ্ণচামর ২০ শুক্লচামর ১০। ইতি শক ১৪৭৭ মাস আষাঢ়' (দাস, ১৩৬৬:১৪)।

এছাড়াও ত্রিপুরার সরকারি কাজকর্ম এবং আরাকান রাজদরবারে বাংলা ব্যবহৃত হতো। দেশীয় বৈষ্ণবরা সতের শতকেই বাংলা গদ্য রচনা করতে চেষ্টা করেছিলেন। রূপ গোস্বামীর কারিকা, চণ্ডীদাসের চৈতন্যরূপ প্রাপ্তি, নরোত্তমদাসের দেহককড়চ ইত্যাদিতে গদ্যের নিদর্শন পাওয়া যায় (মুরশিদ, ২০১৯:২৭৬)। আঠারো শতকে লেখা দলিল-দস্তাবেজ এবং চিঠিপত্রের বাংলা গদ্যে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার খুব বেশি লক্ষ করা যায়। সুলতানি এবং মোগল আমলে বাংলা ভাষায় বহু আরবি-ফারসি শব্দ বাংলার শব্দ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ এবং প্রকাশ ক্ষমতা বাড়ালেও বাংলা ভাষায় কোনো যুগান্তর আনতে পারেনি। যা হোক, ইংরেজরা সুলতানদের মতো বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা না করলেও ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করেছিল (মুরশিদ: ২৭৭-৭৮)।

ইংরেজরা আশি বছর পর আদালতের ভাষা হিসেবে ফারসি ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা চালু করেছিল। তবে, ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই শব্দ-ব্যবহার এবং বাক্য-কাঠামোর দিক থেকে বাংলা ভাষায় কালান্তর এসেছিল। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লিখিত দলিল-দস্তাবেজে ইংরেজি শব্দের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। উল্লেখযোগ্য, ইউরোপীয় পণ্ডিতদের হাতেই প্রাথমিক স্তরের বাংলা অভিধান ও ব্যাকরণ রচিত হয়।

ব্যাকরণের আদি উদ্ভব ঘটে প্রাচীন ভারত ও গ্রিসে। কালক্রমে ওই ব্যাকরণ বিভিন্ন ভাষা বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। গ্রিক ব্যাকরণ প্রথমে গৃহীত হয় ল্যাটিন ভাষা ব্যাখ্যায়। গ্রিক-ল্যাটিন মিশ্র ব্যাকরণকাঠামো বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষা ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণকাঠামোতে বর্ণিত হয় সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা। পরবর্তীকালে আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ সংস্কৃত ও ইংরেজি ব্যাকরণের মিশ্র কাঠামোতে বিশ্লেষিত হয় (আজাদ, ২০১১:৩৬)। সেজন্য বাংলা ভাষার লিখিত কাঠামোতে সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষার কাঠামোর ছাপ পড়ে যায়।

উইলিয়াম কেরী খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে রামরাম বসুর কাছে বাংলা শিখেছিলেন। রামরাম বসু আরবি- ফারসি মেশানো বাংলার পক্ষপাতি ছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত। উইলিয়াম কেরী যখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের জন্য বাংলা বই রচনার সূত্রপাত করেন, তখন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং রামরাম বসু কেরীর নেতৃত্বে বাংলা বই লেখার দায়িত্ব পান। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রভাবে কেরী সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলার পক্ষপাতি হয়ে ওঠেন এবং আরবি-ফারসি শব্দ বাদ দিয়ে সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলা গদ্যে পাঠ্যবই লিখিয়েছিলেন (মুরশিদ : ২৭৯)।

তখন থেকেই আরবি-ফারসি শব্দ মিশ্রিত বাঙালির মুখের ভাষার কাছাকাছি বাংলা ভাষা সংস্কৃত শব্দ বহুল রূপক গদ্যে পরিণত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, যাঁরা বাংলাকে সংস্কৃতের পথে চালাতে চান, তাঁদের চেষ্টা সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। সাতশত বছর মুসলমানের সাথে একত্রে বাস করে বাংলা মুসলমান হতে অনেক জিনিস গ্রহণ

করেছে। এখন সেসব বাদ দেওয়ার চেষ্টা সফল হবে না। বাংলার বিভক্তি 'রা' ও 'দের' মুসলমানদের কাছ থেকে নেয়া। কলম, দোয়াত, আদালত ইত্যাদি বাদ দেওয়ার জন্য পণ্ডিতগণ প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। তাঁদের চেষ্টা সফল হবে না (শাস্ত্রী, ২০০৯: ৩৮২-৮৩)।

খ্রিস্টান মিশনারি ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগণ যখন বাংলায় ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ ও পাঠ্যপুস্তক রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁদের সামনে বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের আদর্শ না থাকায় সংস্কৃত গদ্যের আদলে বাংলা সাধু গদ্যের মূল কাঠামো রচিত হয়। রামমোহন রায় বেদান্ত গ্রন্থে লিখেছেন "...... বেদান্তশাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতম করিতে পারেন এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। জাঁহাদের সংস্কৃতে বুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর জাঁহারা বুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর সুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক" (রায়, ১৯৯৮:৬)।

রামমোহন রায় ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম 'সাধু ভাষা' কথাটি ব্যবহারের পাশাপাশি আলাপের ভাষা উল্লেখ করেছিলেন। আলাপের ভাষা থেকেই চলিত ভাষা কথাটির উদ্ভব হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। রামমোহনের পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে সাধুভাষা বিকশিত হয়ে সৃজনশীল ও মননধর্মী সাহিত্যের মাধ্যম হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসের বর্ণনায় সাধু ভাষা ব্যবহার করলেও পাত্র-পাত্রীর সংলাপে চলিত গদ্য ব্যবহার করেছেন। বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের ধারাই অনুসরণ করেছেন।

উইলিয়াম কেরীর কথোপকথনের বিভিন্ন শ্রেণির সংলাপে ব্যবহৃত গদ্য যদিও আদর্শ চলিত বাংলা ছিল না, তবুও এখানেই চলিত গদ্য সাহিত্যের প্রথম প্রবেশাধিকার বলে ধরে নেয়া হয়। বিদ্যাসাগর শকুন্তলার সংলাপে কিছু চলিত গদ্য ব্যবহার করেন। কলকাতা অঞ্চলের চলিত ভাষাকে কিঞ্চিৎ সাধুভাষার মিশ্রণসহ সাহিত্যে প্রথম রূপ দেন পারীচাঁদ মিত্র। তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) উপন্যাসে। তবে, পুরোপুরি চলিত ভাষার ব্যবহার করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২) গ্রন্থে (শ', ঐ:৬৬৪-৬৫)।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,

> "বাঙ্গালার লিখিত এবং কথিত ভাষায় যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে। বলিতে গেলে, কিছুকাল পূর্বে দুইটি পৃথক ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধু ভাষা; অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। পুস্তকে প্রথম ভাষাটি ভিন্ন, দ্বিতীয়টির কোন চিহ্ন পাওয়া যাই না। . . . গদ্য গ্রন্থাদিতে সাধু ভাষা ভিন্ন আর কিছু ব্যবহার হইত না। . . . টেকচাঁদ ঠাকুর

প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত। ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় "আলালের ঘরের দুলাল" প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। . . . সেই দিন হইতে সাধুভাষা, এবং অপর ভাষা, দুই প্রকার ভাষাতেই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন হইতে লাগিল। লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ, কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্ত সঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। . . . গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না। কেন না, এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্বল এবং অপরিমার্জিত। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত।" (চট্টোপাধ্যায়, ১৩৯২:৩৬৯-৭৩)।

সাহিত্যে চলিত ভাষা প্রচলনের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন,

"বাংলাভাষাকে চিনতে হবে ভালো করে; কোথায় তার শক্তি, কোথায় তার দুর্বলতা, দুইই আমাদের জানা চাই। রূপকথায় বলে, এক-যে ছিল রাজা, তার দুই ছিল রানী, সুয়োরানী আর দুয়োরানী। তেমনি বাংলাবাক্যাধীপেরও আছে দুই রানী—একটাকে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে সাধু ভাষা; আর-একটাকে কথ্য ভাষা, কেউ বলে চলতি ভাষা, আমার কোনো কোনো লেখায় আমি বলেছি প্রাকৃত বাংলা। সাধু ভাষা মাজাঘষা, সংস্কৃতি ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চলতি ভাষার আটপৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা। . . . বাংলায় চলতি ভাষা বহু কাল ধরে জায়গা পেয়েছে সাধারণ মাটির ঘরে, হেঁশেলের সঙ্গে, গোয়ালের ধারে, গোবর-নিকোনো আঙিনার পাশে যেখানে সন্ধেবেলায় প্রদীপ জ্বালানো হয় তুলসীতলায় আর বোষ্টমী এসে নাম শুনিয়ে যায় ভোরবেলাতে। গল্পের শেষ অংশটা এখনো সম্পূর্ণ আসে নি, কিন্তু আমার বিশ্বাস সুয়োরানী নেবেন বিদায় আর একলা দুয়োরানী বসবেন রাজাসনে। চলতি ভাষার চলার বিরাম নেই, তার চলবার শক্তি আড়ষ্ট হবার সময় পায় না।" (ঠাকুর, ২০০০:৬১১)

মনে করা হয়, রামমোহনের আলাপের ভাষা, বঙ্কিমের প্রচলিত ভাষা, রবীন্দ্রনাথের চলতি ভাষা থেকেই পববর্তীকালে চলিত ভাষা কথাটির প্রচলন হয়েছে।

৪. বাংলা চলিতরীতি প্রতিষ্ঠায় প্রমথ চৌধুরী

বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর আগমন রবীন্দ্রনাথের পরে। তিনি মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের (?-১৯২১) প্রায় সমসাময়িক এবং মুকুন্দদেবের পিতা ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপ্যাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) কে কাছে থেকে দেখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে

পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার কারণে বঙ্কিমের সাহিত্যচর্চা, ধর্মবোধ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি ভালোভাবে জেনেছিলেন (রহমান, ১৯৯৮:৬২)।

ভাষার ভিন্নশৈলী নির্মাণ এবং চলিত ভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে প্রমথ চৌধুরী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিপ্লব এনেছিলেন। প্রমথ চৌধুরী যেমন জ্ঞানবাদী সাহিত্যিক ছিলেন, তেমনি ইন্দ্রিয়বাদী দার্শনিক ছিলেন। যুক্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝেছিলেন, ভবিষ্যতের বাংলা গদ্য কথ্য বাংলাতেই গড়ে ওঠবে। তাঁর এই অনুভব, দৃঢ় বিশ্বাসের নামান্তর এবং এখন তা সত্যে পরিণত। উল্লেখযোগ্য, প্রমথ চৌধুরী প্রেস্পর মেরিমের (১৮৩০-৭০) ছোটগল্প 'Levase Ec' trusque'-এর বাংলা 'ফুলদানি' (১২৯৮) সাধুভাষায় অনুবাদ করেন (রহমান : ২১)।

প্রমথ চৌধুরী বিশ্বাস করতেন, ভাষা সাহিত্যের প্রাণ। ভাষা দুর্বল হলে বিষয়ের প্রকাশ দুর্বল হতে বাধ্য। উনিশ শতকের গদ্য সংস্কৃত শব্দের প্রাবল্যে এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী সাধুভাষা হওয়ায় সাহিত্যের ভাষা ও মুখের ভাষার মধ্যে পার্থক্য ঘটেছে। সাধুভাষার সাথে বাংলা মৌখিক ভাষার কোনো মিল না থাকার বিষয়টি প্রমথ চৌধুরীকে ব্যথিত করেছিল। সেজন্য প্রমথ চৌধুরী মুখের ভাষার কাছাকাছি চলিত গদ্য প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন।

প্রমথ চৌধুরী চলিত গদ্য প্রচলের মহানায়ক। তিনি সাহিত্যে এসেছিলেন চলিত গদ্যরীতিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং এতে তিনি সার্থক হয়েছিলেন (আজাদ, ২০১৭: ১৪৪)। প্রমথ চৌধুরীর গাঢ়বন্ধ ও অ-গতানুগতিক পদ্য ও গদ্য রচনা পড়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে আধুনিকতার পথে পরিচালিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নির্মল বুদ্ধির, অনাবিল চিন্তার ও শাণিত রচনার বিষয়গুলো চলিত গদ্যে রচিত হওয়ায় সর্বস্তরের লোকের বোঝার ও রস আস্বাদন সহজ হয়। এ উদ্দেশ্যে প্রমথ চৌধুরী ১৫ বৈশাখ ১৩২১ বঙ্গাব্দে 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশ করেন।

'সবুজপত্র' পত্রিকাটি মূলত চলিত রীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্যই প্রকাশিত হয়েছিল। এতে কোনো বিজ্ঞাপন দেয়া হতো না। ব্যবসায়িক কোনো উদ্দেশ্যে এ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়নি। পত্রিকাটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ভূমিকা ছিল এবং 'সবুজপত্র' নামটি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথেরই দেয়া (সেন, ২০১৫:৮৮-৯০)। 'সবুজপত্র' শুধু একটি পত্রিকা নয়। এটি একাধারে বাংলা লিখিত রূপ সাধুরীতি থেকে চলিতরীতি প্রবর্তনের নিরেট দলিল এবং একই সাথে প্রমথ চৌধুরীর মননবিকাশের অপূর্ব অবলম্বন।

'সবুজপত্র' পত্রিকায় প্রমথ চৌধুরী রচিত গল্প 'চার ইয়ারি কথা' প্রকাশিত হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "তুমি যখন প্রথম গণ্ডী পেরিয়েছ তখন আর গল্প লেখায় তোমাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না–এখন থেকে তোমার এই এক বহু হবার পথে চলল।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমথ চৌধুরীর রচনায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সে প্রতিভার স্বরূপ লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথই প্রথম আহ্বান জানিয়েছিলেন, "জীর্ণ চলা ঝরিয়ে দিয়ে প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি"। ১৩২০ অগ্রহায়ণ মাসে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। সে সভায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে দেশবাসীর প্রতি কটাক্ষ ছিল। ফলে সম্বর্ধনা সভার অতিথিগণ ক্ষুব্ধ হন এবং কিছুদিন ধরে বিভিন্ন পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিষোদগার চলতে থাকে। তাতে রবীন্দ্রনাথ মর্মাহত হন এবং সাময়িক পত্রিকাতে কোনোদিন কিছু লিখবেন না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সময় মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রমথ চৌধুরী একটি পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প করেন এবং রবীন্দ্রনাথ সেই পত্রিকাতে লিখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রমথ চৌধুরী পরবর্তীকালে স্বীকার করেছেন, রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অনুসারেই 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশ করা হয় (রায়, ২০১৩:২১)। জীবনচর্চা ও চর্যা, রূপের বহিরঙ্গ নির্মাণ, ভাব ও আবেগের উদ্বেলতার উর্ধ্বায়তের নয়নবিমোহী জৌলুসের উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে, প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর 'সবুজপত্র'-এর কাছে আমাদের যেতে হয় (রায়: ২২৩)। রবীন্দ্রনাথ চলিত ভাষায় 'সবুজপত্র' পত্রিকায় গল্প লিখেছিলেন, যেমন, 'স্ত্রীর পত্র'; উপন্যাস যেমন, 'ঘরে বাইরে' ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিকতার দ্বিতীয় অধ্যায় সূচিত হয়। 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে রচনার পালাবদলের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়:

- জীবনের সঙ্গে মননের সংযোগের বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে বর্তমানের বেদনা ও চিন্তা মেনে নিয়ে নিজের শক্তিতে সাহিত্য রচনা করা;
- পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পাশাপাশি বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি ও চিন্তার প্রকাশ করা;
- পুঁথিগত চিন্তার বাইরে গিয়ে নিজস্ব চিন্তায় স্বাধীনভাবে সাহিত্য রচনা করা;
- সংস্কৃত-ব্যাকরণপীড়িত, শিক্ষার্থী-অনুকৃত, বক্তৃতা-উপদেশের জন্য ব্যবহৃত সাধুভাষার পরিবর্তে মুখের ভাষার কাছাকাছি চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনা করা (সেন, ২০১৫:৮৯)।

'সবুজপত্র'-এর যুগে একদল প্রাবন্ধিকের আবির্ভাব ঘটেছিল, যাঁরা নিজেদের মতো করে চিন্তা ও বিচার করতে পারতেন, অন্যের চিন্তার ভার অযথা বহন করে চলতেন না। তাঁদের বলার বিষয় হালকা ছিল না, কিন্তু বলার ধরণ হালকা ছিল (রায়, ২০০৮:৩)।

'সবুজপত্র' সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন, বাংলাদেশ সবুজ। বাংলা মায়ের শস্যশ্যামল-রূপ ও প্রকৃতি গদ্যেপদ্যে বর্ণনা করে শেষ করা দুঃসাধ্য। সবুজ বাংলার শুধু দেশজোড়া রং নয়, বারো মাসে রং। ঋতু পরিবর্তনের সাথে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক

বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। প্রকৃতির নানা রঙের মধ্যে মেঘের রঙ ও ফুলের রং ক্ষণস্থায়ী; প্রকৃতির বিভিন্ন রাগরং তার বিভাব ও অনুভাব মাত্র। তার স্থায়ী ভাবের, তার মূল রসের পরিচয় শুধু সবুজে। বাংলার সবুজ পত্রে যে সুসমাচার লেখা আছে, তা পড়বার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক হবার প্রয়োজন নেই; কারণ সে লেখার ভাষা বাংলার প্রাকৃত (চৌধুরী, ১৯৯৮:৪৭)।

'সবুজপত্র' বিষয়ে প্রমথ চৌধুরীর বর্ণনা প্রাণিধানযোগ্য, তারিখ এগিয়ে কিংবা পিছিয়ে দিয়ে যৌবনকে ফাঁকি দেয়া যায় না। সবুজ ক্রমে পেকে লাল হয়ে ওঠবে। সবুজের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য আলো আর বাতাস চাই। অন্ধকারে সবুজ ভয়ে নীল হয়ে যায়। বন্ধ ঘরে সবুজ দুঃখে বিবর্ণ হয়ে যায়। সবুজ পত্রে সকল বর্ণের প্রবেশের সমান অধিকার থাকবে। উষার গোলাপি, আকাশের নীল, সন্ধ্যার লাল, মেঘের নীল- লোহিত, আলোচনা-সমালোচনার স্বরূপে সবুজপত্রের গায়ে সংলগ্ন হয়ে তার কোমল আলো ছড়িয়ে দেবে। সবুজ পত্র কখনো শুষ্ক পত্রের রূপ ধারণ করবে না (চৌধুরী:৪৯)।

সেকালে, সংস্কৃত পণ্ডিতগণ চলিত ভাষাকে ঘৃণা করতেন। এ বিষয়ে প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন, "যারা মাতৃভাষাকে ইতর ভাষা বলে গণ্য করেন তাঁরা হয়তো বঙ্গ ভাষায় সাহিত্য রচনা ব্যাপারটি 'নীচের উচ্চাভাষণ' স্বরূপ মনে করেন, এবং সুবুদ্ধিবশত ও রূপ দাম্ভিকতা হেসে উড়িয়ে দেওয়াটাই সংগত বিবেচনা করেন" (ঐ:২৭৩)। বাংলা অভিধানে বিপুল সংখ্যক সংস্কৃত শব্দ আছে, যার ব্যবহার বাংলাভাষায় নিতান্তই নগন্য। বাংলা ভাষার অস্তিত্ব প্রকৃতিবাদ অভিধানের ভিতর নয়, বাঙালির মুখে (চৌধুরী:২৫৬)।

৫. উপসংহার

'সবুজপত্র' (১৯১৪) প্রকাশের পর চলিত ভাষা বিরোধীদের আন্দোলন তীব্র হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে চিন্তা ও যুক্তিশীল চলিত গদ্যের প্রসারণে সবুজপত্রের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। প্রমথ চৌধুরী গতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। সভ্যতা বিকাশের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন প্রিয়তা যে অনিবার্য, পরিবর্তনহীনতা যে মৃত্যুর স্মারক, ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের প্রবন্ধেও একথা তিনি বলতে দ্বিধা করেন নি (রহমান, ঐ:৭৫-৭৬)।

মধ্যযুগে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে, বাংলা ভাষার বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক ভাষা পরিহারের বিষয়টি লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে, লিখিত ভাষার জন্য সর্বমান্য সর্ববঙ্গীয় ভাষারূপ ও সর্বজনীন ভাষারূপ গঠনের প্রক্রিয়া চলে। বাংলা মানভাষা গঠনের ক্ষেত্রে দুটি রীতি; অর্থাৎ, সাধুরীতি ও চলিতরীতির বিকাশ তখন থেকেই ঘটতে থাকে।

মধ্যযুগ থেকে শুরু করে উনিশ শতকে সাধুরীতির পূর্ণাঙ্গ মানরূপ বিকশিত হয়। চলিতরীতি বিকাশে ধীরগতি লক্ষ করা গেলেও মধ্যযুগ থেকেই প্রক্রিয়া শুরু হয়। মধ্যযুগ থেকে উনিশ শতক এবং বিশ শতকে চলিতরীতি পূর্ণাঙ্গ বিকশিত ও সর্বমান্য রীতির মর্যাদা পায়।

বাংলা গদ্য সাহিত্যে, লিখিত ভাষার ক্ষেত্রে সাধুভাষা ও চলিত ভাষা বিরোধ সাহিত্যসেবীদের বিভক্ত করেছিল। প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রখর দৃষ্টি চলিত ভাষা প্রচলনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রমথ চৌধুরী একাধারে কবি, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক ছিলেন। তবে, বাঙলা ভাষার চলিত রীতি প্রচলনের জন্য সবুজপত্রের প্রকাশক ও সম্পাদক হিসেবে প্রমথ চৌধুরীর যে খ্যাতি তা বিস্ময়কর। বাংলা ভাষার প্রায়োগিক ক্ষেত্রে চলিতরীতির ব্যবহার অপরিহার্য ছিল। একটি ভাষার জন্য দুটি সর্বজন স্বীকৃত লিখিতরূপ চালু থাকা সাহিত্য রচনার জন্য দুরূহের পাশাপাশি সাধু রীতি ও চলিত রীতির মিশ্রণও ঘটতো। প্রমথ চৌধুরী বাংলা লিখিতরূপের ক্ষেত্রে, সাধুরীতির রূপক ব্যবহার থেকে চলিতরীতির ব্যবহার বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জি

আনিসুজ্জামান, (১৯৮৪)। *পুরোনো বাংলা গদ্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি

কামাল, আবু হেনা মোস্তফা, (২০১৬)। *কথা ও কবিতা*, ঢাকা: সময়

ভট্টাচার্য, সুশীল, (২০১৮)। *বাংলা উপন্যাসের ক্রমবিকাশ*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: অক্ষরবিন্যাস

‘শ, রামেশ্বর, (১৪০৩)। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, *বাঙ্গলা ভাষা*, হুমায়ুন আজাদ (সম্পা.) (২০০৯)। *বাঙলা ভাষা* দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী

রহমান, মোহাম্মদ সিদ্দিকুর, (১৯৯৮)। *প্রমথ চৌধুরী বাংলা ভাষা ও গদ্যচিন্তা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি

সেন, নবেন্দু, (২০০১)। *বাংলা গদ্য স্টাইলিসটিকস*, কলকাতা: সময় পাবলিকেশন (প্রা.) লিমিটেড

চৌধুরী, প্রমথ, (১৯৯৮)। *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ

রায়, জীবেন্দ্র সিংহ, (২০০৮)। *কল্লোলের কাল*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

(২০১৩)। *প্রমথ চৌধুরী*, কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

রায়, রামমোহন, (১৯৮৮)। *রামমোহন রচনাবলী*, অজিতকুমার ঘোষ (প্রধা.সম্পা.), কলকাতা: হরফ প্রকাশনী

মুরশিদ, গোলাম, (২০১৯)। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, ঢাকা: অবসর

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (২০০৪)। *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, ঢাকা: ঐতিহ্য, বাংলা বাজার

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, (১৩৯২)। *যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ।

সেন, সুকুমার, (২০১৫)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিডেট।

আজাদ, হুমায়ূন, (সম্পা.) (২০১৫)। *লাল নীল দীপাবলী বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

আজাদ, হুমায়ূন, (২০১১)। *বাঙলা ভাষা*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

দাস, সজনীকান্ত, (১৩৬৬ শ্রাবণ)। *বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস*, ১২ কলিকাতা বঙ্কিম চাটুর্য্যে স্ট্রীট।